ফতোয়াবাজির কারণে ১৫ বছরে ২৬ নারীর আত্মহত্যা

পাঁচ বছরেও কার্যকর হয়নি হাইকোর্টের রায়

মানসুরা হোসাইন

দেশে ফতোয়াবাজির ঘটনা বাড়ছে। এসব ফতোয়াবাজির শিকার হচ্ছেন মূলত নারীরা। ফতোয়াবাজি এবং পরবর্তী সময়ে পাথর বা দোররা মারাসহ অপমান-নির্যাতনের কারণে ১৯৯০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৬ জন নারী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে জানা যায়, বিয়ে, হিল্লা বিয়ে, তালাক, যৌতুক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রেম, এনজিওর কাজ করাসহ বিভিন্ন অজুহাতে ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত ৩৩৩টি ফতোয়াবাজির ঘটনা ঘটেছে। আর এতে ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

বগুড়ার ধুনট উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামের ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী আঙ্গুরী খাতুনকে একা ঘরে পেয়ে এ কই গ্রামের মনসের আলী তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। আঙ্গুরীর চিৎকারে লোকজন এসে মনসেরকে আটক করে। কিন্তু গ্রাম্য সালিসের রায়ে দুজনকেই অভিযুক্ত করা হয়। মনসেরকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা এ বং উভয়কে ১০০ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্প্রতি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রেম করে বিয়ে করার অপরাধে ১০০ দোররা মারার সময় স্ত্রীর গর্ভের আট মাসের সন্তান মারা যায়।

প্রায় পাঁচ বছর আগে হাইকোর্ট ফতোয়াবাজিকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু আপিল বিভাগের নির্দেশে সে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রয়েছে। আর তাই ফতোয়ার লাগামহীন ঘটনা ঘটেই চলেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম বলেন, নারী নির্যাতনকারী ফতোয়াবাজরা ১৯৯০ সাল থেকেই কখনো পাথর ছুড়ে মারার, কখনো দোররা মারার ঘটনা ঘটিয়েই চলেছে। সিলেটের ছাতকছড়ায় ফতোয়ার শিকার নূরজাহানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে সময় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে কোনো সহায়তা পাইনি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে ছাতকছড়ার নূরজাহানকে প্রথম স্বামী তালাক দিলে নূরজাহানের বাবা তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেন। কিন্তু সমাজপতিদের স্বার্থ হাসিলের জন্য স্থানীয় মাওলানা আবদুল মান্নান দ্বিতীয় বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং নূরজাহানকে গর্তে অর্ধেক পুঁতে ১০১টি পাথর ছুড়ে মারার ফতোয়া দেন। এ ধরনের অপমান ও নির্যাতন সইতে না পেরে নূরজাহান আত্মহত্যা করেন।

১৯৯৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বপ্নাহার ধর্ষণের শিকার এবং পরে গর্ভবতী হন। কিন্তু ধর্ষণের সময় কোনো সাক্ষী না থাকার অপরাধে ধর্ষককে নির্দোষ এবং স্বপ্নাহারকে ১০০ দোররা মারার ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য বিভিন্ন সংগঠন এবং থানার সহায়তায় স্বপ্নাহারকে ফতোয়ার কবল থেকে উদ্ধার করা হয়।

বিভিন্ন সময় নারীদের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও বহু ফতোয়াবাজি হয়েছে। জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা ওবায়দুল হক নারী নেতৃত্বকে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী হিসেবে বহুবার ফতোয়া দিয়েছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ, আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো, ব্র্যাক বা গ্রামীণ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া, ব্র্যাকের লাগানো তুঁত গাছ পাহারা দেওয়া—এ রকম অনেক কাজকেই অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে ফতোয়াবাজি হয়েছে।

'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' অনুযায়ী ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অথবা ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মুফতিরাই কেবল ফতোয়া দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হীন স্বার্থে ফতোয়া দেন ও ফতোয়ার ব্যবহার করেন। আর এ ধরনের ফতোয়াবাজির শিকার হন মূলত নারীরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গ্রামের একশ্রেণীর আলেম, মোড়ল, মাতবর, জোতদার, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা চেয়ারম্যানরা তাদের হীন স্বার্থ রক্ষায় ফতোয়াবাজি করে।

এ প্রসঙ্গে আইন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ফতোয়া দেওয়ার আইনগত অধিকার কারোরই নেই। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ নম্বর ধারায় মৌখিক তালাক ও হিল্লা বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে ফতোয়াবাজির ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত ইসলামি ঐক্য সংস্থার সম্মেলনেও ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

নওগাঁর কির্ত্তিপুর ইউনিয়নের আতিকা গ্রামের সাইফুল ও শাহিদা দম্পতির মৌখিক তালাককে কেন্দ্র করে জনৈক হাজি আজিজুল হক হিল্লা বিয়ে ছাড়া স্বামীর ঘরে যেতে পারবে না বলে ফতোয়া দেন।

এ মৌখিক তালাক ও হিল্লা বিয়েকে কেন্দ্র করে ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ সব ধরনের ফতোয়াবাজিকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেন।

এ রায়ের বিভিন্ন সুপারিশ অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রচলিত মুসলিম আইনসহ যেকোনো আইনের মতামতসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা একমাত্র আদালতেরই আছে। রায়ে ফতোয়াবাজির ঘটনাকে দ্রুত আমলে নিতে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশদের প্রতি নির্দেশ প্রদান, স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে সব স্কুল ও মাদ্রাসায় মুসলিম পারিবারিক আইন পাঠ আবশ্যিকভাবে চালু করা এবং জুমার দিন এ আইনটি আলোচনা করার জন্য মসজিদের ইমামদের প্রতি নির্দেশ পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। রায়ে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে সংবিধানের ৪১ (১) অনুচ্ছেদের আলোকে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়নেরও সুপারিশ করা হয়।

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রাব্বানী বলেন, রায়টির বিভিন্ন সুপারিশ আপিল আদালতের নির্দেশে দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত আছে। তিনি বলেন, তার জীবদ্দশায় বিষয়টির একটি নিষ্পত্তি দেখে যেতে পারলে তিনি খুশি হবেন। তিনি বলেন, রায়ের মাধ্যমে মৌখিক তালাক কিংবা হিল্লা বিয়ে বেআইনি হলেও সব ধরনের ফতোয়ার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হচ্ছে না। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মামলা হয় না

দেশে ফতোয়াবাজির প্রচুর ঘটনা ঘটলেও এ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা খুবই কম। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মাত্র ৩৯টি মামলা হয়েছে। ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবল ২০০৫ সালেই ফতোয়ার শিকার হয়েছেন ৪৩ জন, এর মধ্যে নির্যাতনে আহত হয়েছেন ১৩ জন এবং নিহত হয়েছেন চারজন। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে মাত্র পাঁচটি এ বং গ্রেপ্তার হয়েছে ৯ জন।

মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন বলেন, বাংলাদেশের আইনব্যবস্থায় কখনোই ফতোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফতোয়া আমাদের সংবিধান এবং দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনকেও লঙ্ঘন করছে। তিনি বলেন, ফতোয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

প্রথম আলো